০১-০৭-২০১৬ : প্রাতঃ মুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতন নিরহংকারী আর নিষ্কাম সেবাধারী, -এ রকম আর কেউই হয় না। যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বেরই রাজত্ব বাচ্চাদেরকে প্রদান করে, উঁনি নিজে বানপ্রস্থে গিয়ে বসে থাকেন।"

প্রশ্ন :- বাবার কি এমন বার্তা সমস্ত পৃথিবীতেই তা ছড়িয়ে দিতে হবে, তোমাদেরকেই ?

উত্তর :- তোমরা সবাইকেই এই বার্তা জানাও যে, তোমরা দুঃখ- হরণকারী সুখ-প্রদানকারীর সন্তান। তাই তোমরা কদাপি কাউকে দুঃখ দিতে পারো না। যেহেতু তোমরা সুখ প্রদানকারী বাবার স্মরণে থাকো। তাই ওনাকে অনুসরণ করলেই অর্দ্ধেক কল্পের জন্য সুখ-ধামের বাসিন্দা হতে পারবে। এই বার্তাই সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে। আরও জানাতে হবে যে, যে বা যারা এই বার্তানুসারে তা ধারণ করে, নিজেদের জীবন-যাপন করবে,- তারাই ২১ জন্মের নিমিত্তে মায়ার অজ্ঞানতার নাগপাশ থেকে মুক্ত থাকবে।

গীত :- হামারে তীরথ্ ন্যারে হ্যায় ....(আমাদের এই তীর্থ-যাত্রা একেবারেই পৃথক ধরণের ... ...)

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চারা এই গীতের মর্মার্থ তো জানেই। যেহেতু উনি (পরমাত্মা) আমাদের আত্মাদের বাবা। এক্ষেত্রে আত্মা শব্দটি-ই হচ্ছে মুখ্য বা প্রধান। তোমরা বাচ্চারা এটা তো অনুধাবন করতে পারছো, আমাদের আত্মা পরমপিতা পরমাত্মা - সামনেই বসে আছেন। অর্থাৎ তোমাদের আত্মাই পরমাত্মার সামনেই রয়েছে। তোমাদের তো নিজস্ব একটা শরীর আছে - কিন্তু ইনি (পরমাত্মা) তো অপরের শরীর ধার করে, তাতে অবস্থান করছেন। জাগতিক গুরুরা তো তাদের মনুষ্য-শিষ্যদেরকে নিয়ে তীর্থ-যাত্রায় যান। ভক্তি-মার্গে তো এরকম প্রচুর সংখ্যক গুরু থাকে। ভারতীয় নারীরা তো আবার তাদের পতি-কেও গুরু বা ঈশ্বরের মান্যতা দেয়। এই অসীমের বাবাও সেরকম ভাবে বাচ্চাদেরকে বোঝায় যে, তোমরা তো আমারই বাচ্চা। তোমরা তা বুঝতেও পারো ইঁনি-ই সেই অসীমের বাবা - যাঁর বাচ্চা তোমরা। ইঁনি আবার এই সময়ে এই ধরায় এসেছেন, আবার ওনার বাচ্চাদেরকে আশীর্ব্বাদের বর্সা দিতে। অতএব আমাদের এখন সেই সদ্গতিকে হাসিল করতে হবে। এটা অবশ্যই নিজেদেরকেই নিশ্চয় করতে হবে। যেখানে সমস্ত দুনিয়াটাই এখন দুর্গতির কবলে। যা সম্পূর্ণ পতিত অবস্থায় পরিনত হয়েছে। তাই তো পবিত্র হবার জন্য ওনাকে স্মরণ করা হয়। অথচ, ভারতেই তো কত শত গুরু আছে। কারও শিষ্য সংখ্যা ১০০, কারও বা ৫০০ আবার কারও ৫০-জন শিষ্যও থাকে। আবার এমনও আছে যে, যার শিষ্য সংখ্যা লক্ষাধিক বা কোটিও হবে হয়তো। যেমন (খোঁজা) মুসলিম্ ধর্মের গুরু আগা-খাঁ নামের এক গুরু। ওনার কত বিপুল সংখ্যক শিষ্য ছিল। তারা সবাই ওনাকে কত সন্মানও করতো। উনি যাই কিছু করুক না কেন, শিষ্যরা কিন্তু ওনাকে খুবই মান-সন্মান করতো। ভক্তি-মার্গেও অনেক প্রকারের গুরু থাকে। তারা আবার তাদের ক্রমানুসারে নানা স্তরের পদাধিকারের হয়। সেই হিসেবে তাদের রোজগারও হয়ে থাকে। কারও কারও তো লক্ষ-কোটি-ও হয়। আগা-খাঁরও বিপুল রোজগার ছিল। ওনার শিষ্যরা -তার ওজনের হীরেতে তাকে ওজন করে, তা তাকে দান করা করেছিলো। পাল্লার একদিকে গুরু আগা-খাঁ, অপর দিকে হীরে-রত্ন। এই দানের পরিমান কি বিপুল সংখ্যক হীরে - যা

ওনাকে দান করা হলো। যেমন আজকাল অনেককেই সোনায় ওজন করে তা তাকে দান করা হয়। হীরের পরেই দ্বিতীয় মুল্যবান - প্লাটিনাম্ বা প্লেটেনিয়ম, -যা সোনার চাইতেও দামী। গুরুকে তাতেও ওজন করে তা দান করে কেউ কেউ। এবার বোঝো সেই গুরুদের কদর কত ! এ ধরনের গুরু তো অনেকেই আছে। কিন্তু, এই বাবা তো হলেন সদ্গুরু। এখন এই সদগুরুকেই বা তোমরা কি দেবে? তোমরা কি তার ওজন করবে ? হীরে দিয়ে ওজন করবে ? কিন্তু, ওনাকে কি ওজন করা যায় ? যেখানে ওনার নিজস্ব কোনও ওজনই তো নাই। এই শিব তো হলেন বিন্দু বা বিন্দী। তার আবার ওজন কিভাবে করতে পারবে তোমরা ? এবার ভাবো, তোমাদের এই গুরু কত আশ্চর্য্যের! যা দুনিয়ার সব কিছু থেকে-ও হাল্কা। যা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম - অতি সূক্ষ্ম। আর কেবলমাত্র এই একজনই তোমাদের প্রকৃত গুরু। এ তো তোমরা বিলক্ষণ জানোই -শিববাবা হচ্ছেন দাতা-স্বরুপ। ভগবান কখনো কারও থেকে কিছু নেন না। ওনার কাজই হলো দেওয়া। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যারা যা কিছু দান করে, তারা তখন মনে মনে ভাবে যে, আগামী জন্মে তার বিনিময়ে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। এ রকম ভাবে কতই না কামনা করে তারা। কিন্তু, ইঁনি অর্থাৎ শিব তো হলেন অসীমের বাবা। এঁনার মতন নিষ্কাম সেবা আর অন্য কেউ-ই তা করতে পারে না। আর সেই নিষ্কাম সেবাও এরকম যে, বাচ্চাদেরকে বিশ্বের অধিকারী বানিয়ে - সুখধামের মালিকে পরিনত করেন। বাবা নিজে তো মোটেই বিশ্বের মালিক হন না। তাই তো এঁনাকেই বলা হয় - সুখের সাগর, শান্তির সাগর, পবিত্রতার সাগর ইত্যাদি। আর একথা বাচ্চাদেরকেও ভালভাবে তা বোঝানো হয়। এই একমাত্র বাবার দ্বারাই তোমরা জীবন-মুক্তি পেয়ে থাকো। যেহেতু, এই বাবার দ্বারা তোমারা স্বর্গের অধিকারী হবার আশীর্ব্বাদী বর্সা পাও। এটাই সঠিক ভাবে নিশ্চয় করতে পারলেই হলো। কেবলমাত্র বাবা আর তার বর্সাকেই স্মরণ করতে হবে। এনাকেই তো জ্ঞাণের সাগর বলা হয়। যদি সবগুলি সাগরের জলকে কালি বানাও, ধরিত্রির সব জঙ্গলকেই কলম বানাও- তবুও তা লিখে শেষ করতে পারবে না। শুরু থেকে তুমি যদি লিখতে থাকো, পুস্তকের পর পুস্তক, তা পুস্তকের পাহাড় হতেই থাকবে। যেহেতু এই জ্ঞাণ এতই মুল্যবান- তাই তা ধারণ করতে হয়। তোমরা তো জানোই, এই জ্ঞাণ কোনও পরম্পরা হিসাবে চলে আসছে না। কেবল মাত্র এই সময়কালেই (সঙ্গমে) এই সুযোগ পাওয়া যায়। এই সময় কালেই বাবা এসে নিজের পরিচয় দেন- এটাই তো আমাদের জন্য অনেক। বাবার পরিচয় পেলেই, আর রচয়িতাকে জানতে পারলেই, তার রচনাকেও জানার জ্ঞান হয়ে যায়। তখনই বুদ্ধিতে সত্যযুগের ধারনা সহজেই চলে আসে। আর যে সত্যযুগে জন্ম নেয়, তার পুনঃজন্মও বেশী বার হয়। পূর্বেও সৃষ্টি-চক্রের প্রথম দিকে যে বা যারা ধরায় এসেছিল, চক্রের চিত্রপট অনুসারে তারাই আবার আসবে। তাই চক্রের এই রীতি-নীতিকে খুব ভাল করেই বোঝানো উচিত। গীতেও তো তা শুনেছো যে, আমাদের এই তীর্থ-যাত্রা, জাগতিক তীর্থ-যাত্রা থেকে একেবারেই পৃথক ধরনের। জাগতিক তীর্থ-যাত্রা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরেই করে আসছো- কিন্তু, তোমাদের এই যাত্রা তো কেবল এই এক জন্মের মাত্র। এই ঈশ্বরীয় যাত্রায় সামান্যতমও কষ্টের ব্যাপার নেই। যেহেতু, এ সব জ্ঞাণ দিচ্ছেন একমাত্র সেই সদ্গুরু। যদিও সেই হিসেবে সদ্গতি তো কারও-ই হয় না। উঁনি (শিববাবা) সুপ্রীম (পরম) জ্ঞাণের সাগর। যার দ্বারা সবারই সদ্গতি হয়ে থাকে। তবে আর কি বা চাই। সত্যযুগে তখন তত্বও (ভৌতিক পরিবেশ) সতোপ্রধান হয়ে যায়। বর্তমানে যা জল, বায়ু ইত্যাদি এত তমোপ্রধান অবস্থায় হয়ে আছে। এর পরে আবার কত ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিও হবে। কিন্তু, সত্যযুগে তো এ ধরণের কোনও প্রকারের দুঃখদায়ী কিছু থাকেই না। যেহেতু এই বাবা যে দুঃখ-হর্তা ও সুখ-কর্তা। আর তোমরা তো ওনারই বাচ্চা। তাই সে সময়ে কেউ-ই দুঃখে থাকবে না। আর তোমরাও কারওকে দুঃখ দেবে না। তাই সবাইকে সেই দিশাই দেখাতে হবে

আর সুখ পাবার উপায় ও বাবার আশীর্ব্বাদের বর্সার অধিকারী বানাতে হবে। তাই বাবা এখন তোমাদেরকে বলছেন, অন্যদেরকেও সুখের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্দ্ধেক কল্পের জন্য বাবা তোমাদেরকে এতই সুখের ব্যবস্থা করেন, যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। তোমরা তো বুঝতেই পেরেছো, বাবার থেকে ২১ জন্মের আশীর্ব্বাদের বর্সা পেয়ে, স্বর্গের (সত্যযুগের) অধিকারী হবার উদ্দেশ্যেই তোমাদের এখানে আসা। তাই তো তোমরা ছাত্রদের মতন এই জ্ঞাণের পাঠ নিচ্ছো। তোমাদের মনে এই আশা যে, শিববাবার থেকে স্বর্গের সুখ নিতে পারলেই, সব দুঃখেরই অবসান ঘটবে। বাবা যে আমাদেরকে সঞ্জীবনী-বুটী প্রদান করেন - যার দ্বারা মহাবীরের জীবন প্রাপ্ত হয়। যার ফলে আগামী ২১ জন্ম কখনও ক্লান্তি আসে না। আর সেই সঞ্জীবনী-বুটী হলো - "মনমনাভব"। সবারই সদ্গতিদাতা সেই একজনই বাবা। যাকে নিরাকারী নিরহংকারী বলা হয়। উনি যেই শরীরের আধার নেন- তিনি অতি সাধারণ ব্যক্তি। তাই তো বাবা বলেন, "আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের আজ্ঞাকারী গরীব বাবা।" মহান ব্যক্তিরা সর্বদা এই ধরণের বাক্যই প্রয়োগ করেন। এ রকম বলেন- 'আমি আজ্ঞাকারী সেবক।' নিজের নামের পূর্বে কখনও শ্রী বা সন্মান সূচক শব্দ লেখেন না। কিন্তু আজকাল যা বহুল প্রচলিত - শ্রী, শ্রীযুক্ত, শ্রীশ্রী, ইত্যাদি ইত্যাদি কত না কি ! তারা নিজেরাই নিজেদেরকে শ্রী-শ্রী বলে প্রচার করে। কিন্তু, এই বাবা যে নিরাকারী, নিরহংকারী- তোমরা যার সন্মুখে বসে আছো এখন। তোমরা বুঝতে পেরেছো, একাধারে উনি যেমন আমাদের বাবা, তেমনি উনি শিক্ষক ও সদ্গুরুও বটে। এমনিতে তো ভক্তি-মার্গে এত সব অনেক গুরুই আছে। আবার তাদের গুরুর-ও গুরু থাকে। কিন্তু, এই বাবার তো কোনও গুরুই নেই। যেহেতু ইনি সদ্ বাবা - সদ্ শিক্ষক - সদ্ গুরু। তোমরা তো অবগত হয়েছো, আত্মাই সংস্কার ধারণ করে। বাবাও কিন্তু আত্মা-স্বরূপ। কিন্তু ওনার আত্মা গুনে পূর্ণ। তোমাদের এক একজনের আত্মায়, এক এক ধরণের পৃথক পৃথক গুনের বৈশিষ্ঠ্য। বর্তমানে তোমাদের আত্মায় যেসব গুনের সমাহার - সে গুনও বাবারই দেওয়া। যা সত্যযুগে তোমাদেরকে দৈবী-গুনে পর্যবেশিত করবে। যেহেতু বাবা যে জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। যদিও কৃষ্ণের মহিমা কিন্তু একেবারেই আলাদা, কারণ তিনি হলেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ। কিন্তু, এই শিববাবাকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা যায় না। যেহেতু উনি তো অচল-স্থির থাকেন। তাই তো বাবা বলেন, তোমরা আমাকে এই উপাধিতে ভূষিত করতে পারো না। যেহেতু আমি (শিব) তো আর বিকারী হই না আর সেই কারণেই আমি সর্বগুন সম্পন্ন হয়েছি। তাই তো তার মহিমা যারা কীর্তণ করে, তাই তারা আমার গুনের মহিমাকে কীর্তণ করে না। কিন্তু এই জ্ঞানের পাঠ যারা কল্প-পূর্বে নিয়েছিল, তারা অবশ্যই আবার এখানে আসবে। তারা এসে বাবার থেকে জ্ঞাণের পাঠই নেবে আর বাবার স্মরণেই থাকবে। অন্যেরা যেই সময়ে কেবল হায়-হায় করে কাঁদতেই থাকবে, আর এদের তখন জয়-জয়কার হয়ে যাবে। এখন তো তোমরা এই (যোগ) যাত্রারও রহস্যকে জানতে পেরেছো। এই যাত্রার ফলে তোমাদেরকে আর মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু, জাগতিক যাত্রার পরে তো সবাইকে ঘরেই ফিরে আসতে হয়। এই যে কত অনেক মনুষ্যেরা স্নানের- যাত্রায় যায়, সমাবেসেতেই বোঝা যায়, ভক্তি-মার্গের কত বিস্তার। সৃষ্টিরূপী ঝাড়-বৃক্ষের এই বিস্তার, কত বিশাল রূপ নিয়েছে। অথচ তার বীজ তো একেবারেই ক্ষুদ্র। ঠিক সেই প্রকারেই ভক্তিরও এত বিস্তার হয়েছে- অথচ, একবার মাত্র জ্ঞান-সাগরে ডুব দিলেই যা সদ্গতি হয়ে যায়। ভক্তি-মার্গে থেকে, পতন হতে হতে, অর্দ্ধেক কল্পই অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু, এই জ্ঞাণ-মার্গের সিঁড়িতে উঠতে মাত্র ১ সেকেন্ড সময় লাগে। কত সুন্দর এই অদৃশ্য অথচ কার্যকারী লিফ্টের রথ। একবারেই যা নীচে থেকে উপরে-নিজের ঘরে পৌঁছে দেয়। একেই বলা হয়, যে যত এগিয়ে যেতে পারে-তাতে তারও যেমন মঙ্গল আবার অন্য সবারই তাতে মঙ্গল। সবারই সদ্গতিদাতা এই এক ও একমাত্র বাবা। এবার জ্ঞাণ

ও ভক্তির তফাৎটা নিজেরাই তা বোঝো। জ্ঞাণ – ভক্তি – বৈরাগ্য, এই তিনটে ব্যাপার আছে। লৌকিক সন্ন্যাসীদের যা হয়, তা তো এই জাগতিক দুনিয়ার বৈরাগ্য। বাবা তাই বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছেন – বৈরাগ্য হয় দুই প্রকারের। (এক) এই জাগতিক দুনিয়ার বৈরাগ্য, যার দ্বারা কারও কোনও প্রকারের সদ্গতি হয় না। আর দ্বিতীয়টি– অসীমের বৈরাগ্য – যার দ্বারা তোমাদের সদ্গতি হয়। আর সেই সদ্গতির উদ্দেশ্যেই এই বাবা তোমাদেরকে সেই শ্রীমত প্রদান করেন – যা ধারণ করে তোমরা শ্রেষ্ঠ থেকেও অতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারো। সেই শ্রেষ্ঠ দুনিয়া স্থাপনের কাজ চলছে সেই শ্রীমতের আধারেই। আর বর্তমানের এই ভ্রষ্ট দুনিয়া চলছে রাবণের মত অনুসারে। ক্রমান্বয়ে আমরা যে শ্রেষ্ট হচ্ছি – তা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারছি। যা বর্তমানের জাগতিক দুনিয়ার লোকেদের সেই ধারণাটাই নেই। উল্টে তোমাদেরকেই দোষারোপ করে বলে যে, এই ব্রহ্মাকুমারীরাই জগতের বিনাশের কারণ। কিন্তু, সত্যিকারের বিনাশ তো অবশ্যই ঘটবে। যার দ্বারা জগতের প্রকৃতই কল্যাণ হবে। কল্যাণকারী বাবা এই দুনিয়ায় এলেই তো সেই মহাভারতের মহা–লড়াই শুরু হয়। তখন তারাই আবার বলবে – আমরা তো আগেই বলেছিলাম, ব্রহ্মাকুমারীরাই এই জগতটাকে বিনাশ করেই ছাড়বে। প্রতি কল্পেই কাল–চক্রের এই বিনাশ কিন্তু অনিবার্য। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। কালের নিয়মে আমরাই তারপর নতুন দুনিয়া স্থাপন করি। সব কিছুই অতি পুরোনো হবার পরে, তা আবার নতুন হওয়া আবশ্যক। তাই কল্পের চক্রানুসারে, প্রতি কল্পেই বিনাশ সাধিত হয় – আর তবেই তো ভারত–ভূমিতে আবার স্বর্গের দ্বার খুলবে। কিন্তু, অন্যেরা এসব বুঝবেই বা কি প্রকারে ? অবশ্য, পরে আগমীতে তা খুব ভালভাবেই অনুভব করবে। বাবা যখন এই ধরায় আসেন নতুন দুনিয়া রচনার উদ্দেশ্যে– তখন তো পুরোনো দুনিয়ার সব কিছুই বিনাশ–প্রাপ্ত হতেই হবে। তোমাদের এই স্থাপনার যজ্ঞটাও তো একটা অলৌকিক ব্যাপার, যার নিমিত্তে তোমরা কত কিছুই আহুতি দাও। যা তোমরা ছাড়া অন্যেরা তা বুঝতেই পারে না। ফলে তোমাদের বিজয় প্রাপ্তিও ঘটে –অর্থাৎ তোমরা পাণ্ডবদের– আর অন্যেরা তাতে ধ্বংশ–প্রাপ্ত হয়। তখন কেবল তোমরা পাণ্ডবেরাই এই নতুন দুনিয়ায় বসবাস করে পরম সুখে রাজত্ব করতে থাকো। এই জ্ঞাণও তাই খুবই অলৌকিক। সবারই দুঃখ–হর্তা, সুখ–কর্তা সদ্গতি দাতা এই এক ও একমাত্র বাবা। যিনি কতই না মিষ্ট, কত স্নেহপরায়ণ। তাই তো আমরা ওনাকে বলে থাকি– মিষ্টি বাবা, আপনি যখন আমাদের নিকট আসবেন, আমরা তখন আপনার রঙে রাঙ্গিয়ে আপনার গলার হার হয়ে যাবো। আপনি ছাড়া আর কেউ–ই যে নেই আমার! অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তোমরা নিজেদের ঘর–বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে বসে থাকবে। তা অবশ্যই করবে না–গৃহস্থের ধর্ম তাকে কর্ম–কর্তব্যের মধ্যেই থাকতে হয়। প্রথমে ৭–দিনের কোর্স করে নিয়ে, তারপর যেখানে খুশী যাও– কিন্তু সর্বদাই "মনমনাভাবে" থাকবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে–আর ওনার আশীর্ব্বাদী বর্সা পেতে থাকবে। কেবল মাত্র স্মরণের যাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। একমাত্র এতেই ভবসাগর পার হওয়া যায়। তোমরা তো অবশ্যই জেনেছো– তোমাদেরকে পবিত্র থাকতেই হবে। আমিষ–এর মতন নোংরা জাতীয় ও অশুদ্ধ খাবার আদৌ খাওয়া উচিত নয়। মুরলী তো অবশ্যই পেতে থাকবে তোমরা। হয়তো এ রকম সময় আসবে, মুরলী আর আসছে না, প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে, চারিদিকে হানাহানি–মারদাঙ্গা ইত্যাদি চলছে– তখন তো মুরলী আসতেই পারবে না। তখন তোমরা এই চর্মচোখেই এখন যা কিছু দেখতে পাচ্ছো– সে সব কিছুই আর অবশিষ্ঠ থাকবে না, তা সব কিছুই ভস্মে পরিণত হবে। তার মানে এই নয় যে প্রলয় হবে। দুনিয়া তো একটাই। এটাই যা একদা নতুন ছিল–সেই নতুন বর্তমানে যার অতি পুরাতন অবস্থা। পরিবর্তনের ফলে সেটাই আবার নতুন অবস্থা প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ তখন তা হবে একটা নতুন পৃথিবী। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটাকে তখন বলা হবে পুরোনো পৃথিবী।

তাই তো তোমরা এখনই এটাকে পুরোনো দুনিয়াই বলবে, যেহেতু এটার আয়ু আর অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু, অন্যেরা আবার বলে থাকে যে-কল্পের আয়ু লাখ লাখ বছর। কলিযুগের ক্ষেত্রেই বলে যে, এখনও এর আয়ু ৪০ হাজার বর্ষ বাকী আছে। কিন্তু, বাস্তবে এই সম্পূর্ণ চক্রটাই মাত্র ৫ হাজার বর্ষের। তোমাদের বুদ্ধিতে তো সেই সব জ্ঞাণ আছেই। কিন্তু মনুষ্য জগৎটাই যে এখন পাথর-বুদ্ধির হয়ে গেছে। আচ্ছা, অভিনয়ের পার্টধারী হয়ে তারা যদি সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক-কেই না জানে বা চেনে, সেক্ষেত্র কি আর বলা যেতে পারে! এই দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোলও যে পুনরাবৃত্তি হয়- তাও তো জানা প্রয়োজন। যারা তা ভালমতন জানে এবং তা বুদ্ধিতে ধারণ করে, অপরকেও ধারণ করায় - সে উচ্চ থেকে অতি উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারে। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে এত করে বলেন, "আমার যা জ্ঞান আছে, সেই সব তো আমি তোমাদেরকেই দিয়ে দিচ্ছি। নাটকের চিত্রপট অনুসারে, সেই জ্ঞাণেরই পুনরাবৃত্তি করে থাকি আমি। যেহেতু এই নাটকে আমারও কর্ম-কর্তব্যের পার্ট থাকে। ভক্তি-মার্গেও তো তোমরা তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করেছো কত, আর এখন আমি এসে তোমাদেরকে আমার আর এই রচনার (দুনিয়ার) আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেই। আমিও কিন্তু এই বিশ্ব-নাটকের বন্ধনে বাঁধা। পুরো কল্পে আমি এই একবারই আসি -নিজের পরিচয় জানাতে আর এই সৃষ্টি রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞাণ শোনাতে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি (সিকীলধে) কল্প পূর্বের হারিয়ে-পাওয়া হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানায় তার নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন আজ্ঞাকারী হতে হবে। কখনও কোনও কথার দ্বারা নিজের অহংকার প্রকাশ করবে না। নিরাকারী আর নিরহংকারী ভাবে থাকতে হবে।
২) বাবা, শিক্ষক আর সদ্গুরুর -এই তিনের সম্মিলিত ব্যবহারের ভাবকে বুঝে, নিশ্চয়বুদ্ধিধারী হয়ে, বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। ঈশ্বরীয় যোগের যাত্রায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

বরদান :- নিজের প্রতি এবং সর্ব আত্মার প্রতি নিয়মানুবর্তীতার রক্ষাকারী নিয়মধারী ও নতুন দুনিয়ার স্থপতিধর হও (ভব)।

যে নিজের প্রতি নিয়মানুবর্তী হয় সে অপরের প্রতিও নিয়মধারী হতে পারে। আর যে নিজেই নিয়মভঙ্গকারী হয়, সে অপরের উপর নিয়ম চালাতে পারে না। অতএব, প্রথমে নিজেই নিজেকে দ্যাখো যে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মনসা, সংকল্প, বাণী, কর্ম, সম্পর্কের দ্বারা একে অপরকে সহযোগ দেবার ক্ষেত্রে, বা সেবাতে, কোথাও কোনও নিয়মভঙ্গ তো হয়নি। কারণ , যে নিয়ম রক্ষাকারী সে কখনও নিয়মভঙ্গকারী হতে পারে না। বর্তমান সময়ে যে নিয়মরক্ষাকারী হয়, সে-ই শান্তির ধ্বজাধারী হয়ে নতুন দুনিয়ার স্থপতিধর হয়।

স্লোগান :- কর্ম করার সময়, সেই কর্মের ভাল বা মন্দের প্রভাবে না এসে - কর্মাতীত হতে হবে।